দাম ২ টাকা

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৫, সংখ্যা: ১০ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | জানুয়ারি ২০১৫

মুর্গি মানুষের সঙ্গে আছে কয়েক হাজার বছর

এই পাখিটি যুগ যুগ ধরে আমাদের পুষ্টি জুগিয়েছে, অসুখে-বিসুখে আমাদের পাশে থেকেছে

মুর্গি খাওয়ার চল দিন দিন বাড়ছে। একটা সময় ছিল যখন বাড়িতে মুর্গি রান্না হত কেবল মাত্র বিশেষ দিনে বা অতিথিকে আপ্পায়ন করার জন্য। আহারে মুর্গি মানে সকাল থেকেই তার তোড়জোড় শুরু হয়ে যেত। আর সকলের মনে থাকত বেশ খুশি খুশি ভাব। এখন তো লোকে মুর্গি হামেসাই খায়, অনেকে রোজই। বলা হচ্ছে পৃথিবীতে এখন মুগির্র মাংসই খাওয়া হয় সব চেয়ে বেশি। সেই অর্থে মুর্গি বিশ্ব জয় করে ফেলেছে।

মুর্গির এই পৃথিবীব্যাপী প্রসার নিয়ে, অনেক গবেষণা করে, এক মস্ত বই লিখে ফেলেছেন অ্যানড্রু ললার। উনি বলেছেন মানুষের সঙ্গে মুর্গির সম্পর্ক বহুদিনের। আর সে সম্পর্ক কেবল খাদ্য-খাদকের ছিল না। তাঁর মতে মানুষের সভ্যতায় অন্য যে কোনও প্রাণীর চেয়ে মুর্গির অবদান অনেক বেশি – কারণ সে খাবারেও আছে, ধর্মেও আছে।

মুর্গি বলতে আমরা যাদের জানি তারা এসেছে বনমুর্গি থেকে। ভারত উপমহাদেশ থেকে ইন্দোনেশিয়া ওই বনমুর্গির বাসভুমি। তারা অত্যন্ত ভিতু প্রকৃতির পাখি। সহজে দেখা দেয় না। এমনকী হঠাৎ মানুষের সামনে পড়ে গেলে হার্ট ফেল করে মারাও যায়। অথচ এ হেন প্রাণীকে মানুষ পোষ মানিয়ে তার নিজের সমাজের অঙ্গ করে ফেলে, আর এমন কোনও দেশ নেই যেখানে মানুষের সঙ্গে চারটে মুর্গি দেখা যায় না।

ব্যাবিলনের সভ্যতায় মুর্গির ছিল এক বিশেষ স্থান। ললার বলেছেন সেখানে পুজো করা হত তাদের। পারস্য সভ্যতায় জোরাথ্রুস্টের অনুগামীরা মনে করতেন মুর্গি শুভবার্তা বহন করে আনে কারণ মোরগের ডাক ঘোষণা করে অন্ধকারের অবসান আর আলোর সূচনা।

মনে করা হত মুর্গি অসুখও সারায়। যেমন, ছেলে-মেয়েদের সর্দিকাশি হলে ইহুদি মায়েরা তাঁদের বাচ্চাদের মুর্গির সুপ খাওয়াতেন। তাঁরা ঠিকই জানতেন। "গত এক দশকে বেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে মুর্গির সুপে এমন পদার্থ আছে যা ঠান্ডা লাগা ভাল না করতে পারলেও সর্দি পড়া বন্ধ করে, এমনকী জ্বরও কমিয়ে দেয়। পেট খারাপ, অবসাদও কমাতে মুর্গির কোনও না কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাজে লাগান হত," ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ললার।

মুর্গির সঙ্গে মানুষের ইতিহাসের আরও এক অধ্যায় খুব নিবিড় ভাবে জড়িয়ে আছে। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে মুর্গিকে জনপ্রিয় করে তোলে তাদের কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিতদাসেরা। পশ্চিম আফ্রিকার মানুষের কাছে মুর্গি ছিল একাধারে খাদ্যবস্তু ও পুন্যপ্রাণী। 'ফ্রায়েড চিকেন' বা 'ভাজা মুর্গি' বলে যে খাবার প্রথমে আমেরিকায় ও পরে বিশ্বের নানা দেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তা মূলত আসে ক্রিতদাসদের কাছ থেকে, বলেছেন ললার।

পিডি

জানা অজানা

মানুষের হাড় হাল্কা হয়ে যাচ্ছে

মানুষ হাল্কা হয়ে গেছে। এক সময় তাদের শরীরের হাড় যতটা ঘন আর পুরু ছিল, এখন আর তেমনটা নেই। ওই 'এক' সময়টা অবশ্য কাল, পরশুর কথা নয় বরং ২০, ৩০, ৪০ হাজার বছর আগেকার কথা। সেই সুদূর অতীতে মানুষের হাড়ের গঠন – বিশেষ করে হাতের কব্জি, কোমর, হাঁটু, পায়ের গোড়ালি – অনেক বেশি মোটা আর ভারি ছিল, আর সেই কারণে সে কালের মানুষের হাড়ের ওজন একালের মানুষের চেয়ে ঢের বেশি ছিল। এ কথা বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস মেডিসিনের গবেষকরা।

নানা ধরনের পরীক্ষার পর তাঁরা বলেছেন যে প্রায় ২০ হাজার বছর আগেও মানুষের হাড় তাদের পূর্বপুরুষ বা এক সময়ের অন্য এক মনুষ্য প্রজাতি নিয়ান্ডারথল বা আজকের নিকটতম আত্মীয় শিম্পাঞ্জির মতই শক্তপোক্ত ছিল। বদলটা এল ১২ হাজার বছর আগে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে সেই সময়েই মানুষের হাড়ের গঠন হাল্কা হয়ে গেছে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, মানুষের জীবনযাত্রা আমূল পাল্টে যাওয়ায় ওই শারীরিক বদলটা ঘটে যায়। তাঁরা বলছেন এক

সময় মানুষ ছিল অরণ্যচারী। শিকার আর ফলমূলই ছিল তার খাদ্যের প্রধান উৎস। বন্য প্রাণী শিকার করতে আর মাঠঘাট জঙ্গলে ঘুরে খাবার যোগাড় করার জন্য তার প্রয়োজন ছিল লোহার মত শক্ত হাড় যা প্রতিদিনকার বাঁচার ধকল সহ্য করতে পারবে।

কিন্তু মানুষ চাষবাস শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনযাত্রা অনেকটাই আরামদায়ক হয়ে ওঠে। লৌহ কঠীন হাড় আর প্রয়োজন হয় না বাঁচার জন্য। প্রকৃতি তাই জীবনের চাহিদাা অনুযায়ী হাড়ের মান বা কোয়ালিটি বদলে তা আগের তুলনায় হাল্কা করে দেয়।

বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা আগামী দিনে মানুষের হাড় আরও পাতলা ও ভঙ্গুর হয়ে উঠবে। কারণ হাঁটাচলা দিন দিন কমছে। গাড়ি, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, আরও কত রকম সব প্রযুক্তি কায়িক শ্রমের প্রয়োজন ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছে। তাই মানুষের হাড় ভবিষ্যতে আরওই হয়ত হাল্কা হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন তঁরা।

ভাইরাস মানুষের ক্ষতি করে, ভালও করে

ভাইরাস শুনলেই এইডস, গুটি বসন্ত আর ইদানীং কালের ইবোলার মত মারাত্মক সব অসুখের কথা মনে আসে। কিন্তু যদি বলা হয়, ওই সব ভয়ঙ্কর ভাইরাসরা, যারা মানুষের ক্ষতি করে বলেই আমরা জানি, তারাই যুগ যুগ ধরে মানুষের বিকাশকে সাহায্য করেছে, তা হলে কি তা অবিশ্বাস্য মনে হবে?

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম প্রাণী হল ভাইরাস। প্রাণ আর জড়ের মাঝামাঝি তাদের অবস্থান। যতক্ষণ না তারা কোনও প্রাণীর কোষের মধ্যে আস্তানা গাড়তে পারছে ততক্ষণ তাদের প্রাণশক্তি বিশেষ লক্ষ করা যায় না। প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্তে, আমাদের শরীরে হাজারও ভাইরাসের অনুপ্রবেশ ঘটছে। আর তাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে আমাদের শরীরের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেই মরণপণ লড়াইয়ে ভাইরাস বাহিনীকে পরাস্ত করে আমরা জয়ী হই। কখনও কখনও অবশ্য তাদের জোরদার

আক্রমণে আমাদের যোদ্ধারা বেসামাল হয়ে পড়ে, আর তখনই ভাইরাস হানাদারের দল আমাদের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দখল করে সেখানে অসুখ ছড়াতে থাকে।

শুধু তাই নয়, ভাইরাসরা চেষ্টা করে তাদের জিনের কিছু চিহ্ন মানুষের কোষের মধ্যে রেখে যেতে, আর এ কাজে তারা সফলও হয় অনেকাংশে। তাই দেখা গেছে যে মানুষের জিন সম্ভারে প্রায় ১০০,০০০ বা আট শতাংশের মধ্যে ভাইরাস জিনের কণা মিশে আছে। কেন এমনটা হয়েছে তার কোনও ব্যাখ্যা অবশ্য এখনও পাওয়া যায় নি। তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন এর ফলে আখেরে লাভ হয়েছে মানুষেরই। নতুন ধরনের জিনের অংশ বিশেষের সঙ্গে তাদের শরীরে আসে ভিন্ন প্রকৃতির ডিএনএ। আর তার ফলে ঘটে এক আশ্চর্য ঘটনা।

জিনে যেমন আছে

প্রাণীদের শরীরে যে হাজার হাজার জিন আছে, তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া আছে। এক দল মাথা ঠিক রাখে, তো আর এক দল হজমশক্তি। কেউ চুল গজাতে ব্যস্ত, তো কেউ নখ। কেউ হৃদযন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকে তো কেউ চালনা করে যকৃৎকে। অর্থাৎ প্রতিমুহূর্তে যে কোনও প্রাণীর শরীরে জিনদের তত্ত্বাবধানে চলতে থাকে এক বিরামহীন কর্মকান্ড।

কিন্তু জিনদের ওই বিপুল কর্ম যোজ্ঞ সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করার জন্য এক 'প্রোমোটার' বা পরিচালক থাকে তাদের মধ্যে। এই পরিচালকরাই জিনের কাজ সঞ্চালন করে, সমন্বয় ঘটায়। কখন কাজের গতি বাড়াতে হবে আর কখন কমাতে, জিন সেই নির্দেশ পায় তাদের ওই পরিচালকের কাছ থেকে। অর্থাৎ একটি প্রাণীর সুষ্ঠ ভাবে বাঁচার চাবিকাঠি ওই জিন পরিচালকদের হাতেই। আর বিস্ময়কর ব্যাপার হল ওই পরিচালকদের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে রয়েছে ভাইরাস জিনের ছায়া।

যে ভাইরাস আমাদের মারে, তারা আবার আমাদের বাঁচায়ও।

অগ্নীশ বড়ুয়া

অক্সিজেন পার্ক

ঝাড়খন্ডের মোরহাবাদিতে তৈরি হবে অক্সিজেন পার্ক। প্রায় ১৬ হাজার বর্গমিটারের একটি খোলা যায়গায় নানা গাছপালার সমাবেশে ছোট্ট একটি বনসহ এই ধরনের পার্ক ভারতে এই প্রথম হবে। আসলে রাঁচিতে প্রচুর ঘরবাড়ি হয়ে সবুজ কমতে থাকায় শহরের বাতাসে পারদের মাত্রা বেড়ে গেছে। বাতাসের এই দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্যই এই উদ্যোগ।

ঠিক হয়েছে পার্কে এমন গাছ লাগানো হবে যেগুলি বেশি পরিমানে অক্সিজেন ছাড়ে এবং পাখিরা যে গাছে বাসা বাঁধতে পারে। যেমন নিম, পিপল। পার্কে থাকবে ৭০ শতাংশ বড় গাছ, বড় ফুলের গাছ ২০ শতাংশ ও ফুলের ছোট গাছ ১০ শতাংশ।

সূত্রঃ পরিষেবা

গলার স্বরে চেনা যায় হেড অফিসের বড়বাবুকে

হেড অফিসের বড়বাবুকে গোঁফ দিয়ে চেনা যেত, অন্তত তেমনটাই লিখেছিলেন সুকুমার রায় তাঁর 'আবলতাবল'-এর ছড়ায়। এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন গলার স্বর দিয়েও নাকি বড়বাবুকে চেনা যায়। তাঁরা বলছেন যে ক্ষমতার চেয়ারে বসলে ব্যক্তির গলার স্বর পাল্টে যায়, আর তাই শুনে বোঝা যায় কর্তৃত্ব কার হাতে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে যখনই কেউ তার কর্তৃত্ব দেখাতে চায় তখন সে শব্দের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে, কিছুটা উচ্চস্বরে, ভারী গলায় কথা বলে। বাবা-মা যখন তাঁদের সন্তানদের শাসন করেন তখন তাঁরা সেভাবেই কথা বলেন, অথবা ক্রেতা যখন বিক্রেতার সঙ্গে দরাদরি করে,

বা রাষ্ট্রনায়করা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যান ডিয়েগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা কর্তৃত্ব আর গলার স্বরের মধ্যে এই সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা এও বলেছেন যে ইংলন্ডের এক সময়কার প্রধানমন্ত্রী মারগারেট থ্যাচারের উদাহরণই তাঁদের গবেষণা শুরু করার অনুপ্রেরণা যোগায়। থ্যাচারের ব্যক্তিত্ব তাঁর নিজের দেশের নেতাদের তো বিশেষভাবে প্রভাবিত করেইছিল, এমনকী দেশ বিদেশের নেতা নেত্রীরাও তাঁকে সমঝে চলতেন। বলা হয়, উনি কথা বলার ক্ষেত্রে গলার স্বর কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নিজেকে একজন খুব আত্মবিশ্বাসী ও রাসভারী ব্যক্তি হিসেবে সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, সে ব্যাপারে পুরদস্তর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তাঁর কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর বাচনভঙ্গি কতটা সহায়ক হয়েছিল, এই প্রশ্ন জেগেছিল গবেষকদের মনে। তাঁরা জানিয়েছেন অনেক রকম পরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা দেখেছেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যাঁরা নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করতে সক্ষম হন তাঁদের কথা বলার ধরন আর কণ্ঠস্বরেই প্রকাশ পায় তাঁদের ওজনদার ব্যক্তিত্ব।

সূত্রঃ ওয়ার্ল্ড সায়েন্স

তাসমানিয়ান ডেভিল

কুকুরও নয় আবার শুয়োরও নয়, দুয়ে মিলেই যেন এই প্রাণীটির সৃষ্টি। কুকুরের থেকে একটু গোলগাল, কালো চামড়ার এই ডেভিল অস্ট্রেলিয়ার একদম নিজস্ব প্রাণী। মানে আর কোথাও তাদের দেখা যায় না। সাধারণত সাপ, পোকামাকড়ই তাদের খাদ্য তবে সুযোগ পেলে ছোটখাটো ক্যাঙারুও খেয়ে ফেলে। দৈর্ঘে দু'ফুটের একটু বেশি এই তাসমানিয়ান ডেভিলদের যত চর্বি জমে তাদের লেজে। বন্য পরিবেশে বাঁচে ৬ বছর। তাসমানিয়ার বেশির ভাগ জাতীয় উদ্যানের বাসিন্দা হলেও রাতচরা এই প্রাণীটির দেখা মেলা ভার। তবে তাদের সংরক্ষণের জন্য তাসমানিয়ান ডেভিল কনজারভেশন পার্ক'ও আছে।

আমিষ, নিরামিষ দুইই পছন্দ কিছু গাছের

গাছ মাংস খায়। অবিশ্বাস্য মনে হলেও, পৃথিবীতে সত্যিই এমন গাছ আছে যারা নানা প্রাণী ধরে খায়। অবশ্যই হাতি বা গন্ডার গিলে খাওয়ার রেওয়াজ তাদের মধ্যে নেই, কিন্তু ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণী শিকার করার ব্যাপারে তারা বেশ পটু। পাহাড়ে জঙ্গলে এ ধরনের গাছ অনেক জায়গায় দেখা যায়। সাধারণত গাছগুলি লতানে হয়, আর তাদের ডালপালা থেকে ঝোলে ছোট ছোট ঘটির মত শারীরিক অঙ্গ, যেগুলির মুখে থাকে পাতার ঢাকনা। ভুল করে পোকামাকড় তার মধ্যে ঢুকে পড়লে, ঘটির ঢাকনাটি চটপট বন্ধ হয়ে যায় আর ভেতরে আটকে পড়া প্রাণীটি তখন আর

ব্লাডারওয়ার্ট গাছ

বেরতে পারে না। শিকার ধরার পর রসকষের সাহায্যে গাছটি প্রাণীটিকে হজম করে ফেলে। এ সব গাছ মাটি থেকে যেমন খাদ্য সঞ্চয় করে, তেমনই আবার পোকামাকড় খেয়েও পুষ্টি অর্জন করে।

স্থলে যেমন শিকারি গাছ আছে, জলেও আছে তারা। এক ধরনের জলজ শিকারি গাছের নাম ব্লাডারওয়ার্ট। এদের শরীরে ঘটির বদলে থাকে ছোটছোট ফুটবলের ব্লাডারের মত বস্তু। সেগুলির মুখেও ঢাকনা থাকে। কিন্তু স্থলের শিকারি গাছেদের ক্ষেত্রে শিকার ধরার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ঢাকনাগুলি খোলাই থাকে, শিকার পড়লে তবেই সেগুলি বন্ধ হয়। অন্য দিকে জলের প্রজাতিদের বেলায় ব্যাপারটি ঠিক উল্টো - ঢাকনাগুলি বন্ধ থাকে, মুখের কাছে শিকার এসে গেছে এমন আভাস পেলেই, সেই বন্ধ দ্বার হঠাৎ খুলে যায়। হুড়মুড় করে জল ঢুকে পড়ে পাত্রে, আর সেই সঙ্গে পোকামাকড় আর ছোটখাট মাছ, যেগুলিকে গাছ হজম করে ফেলে কিছু সময়ের মধ্যেই।

তবে ওই ব্লাডারওয়ার্ট গাছ যে শুধু আমিষ খাবার পছন্দ করে তা নয়, বেশ ভাল মাত্রায় শেওলাও খেয়ে থাকে। আর সে জন্যও তারা তাদের সেই বিশেষ অঙ্গটি ব্যবহার করে। জানা যাচ্ছে তাদের খাদ্যের ১০ শতাংশ আমিষ আর ৫০ শতাংশ নিরামিষ। বাকিটা আসে মাটি আর জল থেকে। বলা হচ্ছে তাদের এই সুসম আহারের ফলে তাদের শারীরিক গঠন খুব ভাল আর তাদের বিস্তারও প্রচুর।

সূত্রঃ ইউরেকা এ্যালার্ট

নতুন প্লাস্টিক

প্লাস্টিক সহজে নষ্ট হয় না। বলা হয় হাজার বছর মাটিতে, নদীতে, সমুদ্রে পড়ে থাকলেও প্লাস্টিক পচে না, গলে না। আর সে কারণেই এই বস্তুটিকে নিয়ে পৃথিবীর যত সমস্যা। ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের জিনিসে ভরে উঠছে মাঠঘাট, বুজে যাচ্ছে নদী নালা, সমুদ্রের অতলে জমছে প্লাস্টিকের স্তুপ। তবে সম্প্রতি খুব ক্ষীণ হলেও এক আশার আলো দেখিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। 'ডাউন টু আর্থ' পত্রিকা থেকে জানা গেল যে, আবিষ্কার হয়েছে এমন এক প্লাস্টিক যা কিনা সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে এলে আস্তে আস্তে ধুলোয় পরিণত হয়ে যায়।

জেনে রাখা ভাল

আমরা জানি সমুদ্র থেকেই প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় ৩০০ থেকে ৩৫০ কোটি বছর আগে। স্থলবাসীদের আবির্ভাব ঘটেছিল অনেক পরে মাত্র ৪০ কোটি বছর আগে। পৃথিবীর ৭১ শতাংশ ঢেকে থাকা সমুদ্র বিপুল সম্পদের ভাঁড়ার হলেও তার সম্পর্কে আমরা এখনও খুব অল্পই জানি। যেমন -

● সমুদ্রের নানা জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী শুধু আমাদের খাদ্যই নয়, তাদের ব্যবহার হয় ওষুধ, আইসক্রিম, টুথপেস্ট, প্রসাধনী দ্রব্য, সার, গোখাদ্য ইত্যাদি তৈরিতেও।

● পৃথিবীতে মাছই হচ্ছে বৃহত্তম প্রাকৃতিক ও চাষ করা যায় এমন প্রোটিনের উৎস। সাগর এই বিপুল প্রোটিনের জোগানদার। বছরে বানিজ্যিক ভাবে এই প্রোটিন উৎপাদিত হয় ৮ কোটি ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন।

● সাগরের নীচে কোরাল বা প্রবাল চেহারায় ও গঠনে

অনেকটাই মানুষের হাড়ের মতো। তাই মানুষের হাড় প্রতিস্থাপনে এই প্রবালের সাহায্য নেওয়া হয় দ্রুত সেরে ওঠার জন্য।

● পৃথিবীর আগ্নেয়গিরিগুলিতে যত অগ্ন্যুৎপাত ঘটে তার ৯০ শতাংশই হয় সমুদ্রের নীচে।

●বিভিন্ন দেশের মধ্যে এখনও বানিজ্যের ৯০ শতাংশই হয় সমুদ্র পথে জাহাজের মাধ্যমে।

●তেল, গ্যাস সমেত বহু খনিজের ভাঁড়ার সমুদ্র।

● মনে করা হয় সাগরের জলে যত নুন মিশে আছে, শুকিয়ে নিলে তার পরিমান যা হবে তাতে সমস্ত মহাদেশগুলোকে প্রায় ৫০০ ফিট মোটা আস্তরণে ঢেকে দেওয়া যেত।

সূত্র : সি-দ্য-সি.অরজ

ভারতের স্নো লেপার্ডদের রাজধানী

হ্যাঁ, তাকে ভারতের স্নো লেপার্ডদের রাজধানী বলা হয়। আবার মনেস্টারির নামেই তার নামকরণ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ হাজার ফিট থেকে সাড়ে ১৯ হাজার ফিটেরও বেশি উচ্চতায় বিস্তৃত সেই হেমিস হাই অল্টিটিউড ন্যাশনাল পার্ক ভারতের একমাত্র জাতীয় উদ্যান, হিমালয়ের উত্তরে যার অবস্থান। ভারতের জম্মু-কাশ্মীরে লাদাখ ডিভিশনে লেহ'জেলায় ১৯৮১ সালে গড়ে ওঠা এই জাতীয় উদ্যানটিকে এখন দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম বলে মনে করা হয়। তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এক কথায় অবর্ণনীয়। সেখানকার তাপমাত্রা তা গড়ে ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট হয় গরমকালে আর শীতকালে থাকে গড়ে - ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট। তাতে কি? ওই ভয়ঙ্কর ঠান্ডাতেও ১৬০০'রও বেশি মানুষের বাস ওই জাতীয় উদ্যানের মধ্যে। তবে আশ্চর্য হতে হয় সেখানকার বিরল ও বিপন্ন প্রাণীদের নাম জানলে।

স্নো লেপার্ড বা তুষার চিতা

হেমিস জাতীয় উদ্যানের যাত্রা শুরু হয়েছিল মারখা, সুমদাহ ও রামবাক ঝোরার ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় ৬০০ বর্গ কিমি সংরক্ষিত অঞ্চল নিয়ে। আকারে বাড়তে বাড়তে বর্তমানে সে ৪৪০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। শোনা যায় একদা তিব্বতের বিখ্যাত সিল্ক রুট গিয়েছিল এই উদ্যানের মধ্যে দিয়েই। এই উদ্যানের মধ্যে রয়েছে বহু বৌদ্ধ চোর্টেন বা চৈত্য ও গোম্ফা। এবং লেহ থেকে ৪০ কিমি দক্ষিণ পূর্বে ৪০০ বছরের প্রাচীন বিখ্যাত হেমিস মনেস্টারিটির নামেই এই উদ্যানের নামকরণ হয়েছে। তিব্বতী বৌদ্ধদের কাছে যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পুন্যস্থান হিসেবে বিবেচিত হয়।

সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে এই হেমিস জাতীয় উদ্যানটি ভারাল ও স্নো-লেপার্ড'র মত বিরল প্রজাতির প্রাণীর আবাস স্থল হিসেবে পরিচিত। প্রায় ২০০'র ওপর স্নো-লেপার্ড বাস করে। আসলে এখানে লেপার্ডদের খাদ্যের তেমন অভাব হয় না। এই হেমিস হাইল্যান্ড ন্যাশনাল পার্ক অঞ্চলে লেপার্ডদের খাদ্য হিসেবে গ্রেট টিবেটান শিপ, ভারাল বা ব্লু শিপ, আইবেক্সদের ছড়াছড়ি। তার ওপর স্থানীয় বাসিন্দাদের ছাগলটা ভেড়াটা তো আছেই। লেপার্ড ছাড়াও এখানে টিবেটান উল্ফ, ইউরেশিয়ান ব্রাউন বেয়ার, লাদাখি উরিয়াল, রেড ফক্সদেরও দেখা মেলে। আর হিমালয়ান মারমোট, হিমালয়ান মাউস হেয়ারদের মত খুব খুদে প্রাণীরাও আছে।

এবং এই জাতীয় উদ্যান পাখি প্রেমিকদের কাছে তো একেবারে স্বর্গরাজ্য বলা যায়। কারণ বিরল সব পাখিদের দেখা মেলে এখানে। গোল্ডেন ঈগল, হিমালয়ান গ্রিফন ভাল্চার ইত্যাদির মত শিকারি পাখি যেমন এখানকার বাসিন্দা তেমনি রবিন অ্যাকসেন্টার, ব্রাউন অ্যাকসেন্টার, টিবেটান স্নোফিঞ্চ, ফর্কটেইল্ড সুইফ্ট, হিমালয়ান স্নোকক ইত্যাদি এমন সব নানা ধরনের টিবেটান পাখির কলরবে মুখর

এবং এই জাতীয় উদ্যান পাখি প্রেমিকদের কাছে তো একেবারে স্বর্গরাজ্য বলা যায়

এই পার্ক যে ভারতের অন্য কোথাও তাদের দেখা পাওয়া যায় না। এখন পর্যন্ত এই উদ্যানে নথিভূক্ত হয়েছে ১৬ রকমের স্তন্যপায়ী প্রাণী ও ৭৩ রকমের পাখির নাম।

এখানে তেমন বৃষ্টি হয় না বলে জুনিপার, আলপাইন,পপলার, বার্চ, ফার ইত্যাদির গাছের শুষ্ক অরণ্য। পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষনীয় হলেও এই জাতীয় উদ্যানের ভিতর সমতলের নানা ন্যাশনাল পার্কের মত কিন্তু কোনও মোটরেবল রাস্তা নেই। এখানে যেতে হয় ট্রেক করে বা পায়ে হেঁটে, মধ্য জুন থেকে মধ্য অক্টোবর। তবে স্নো লেপার্ড দেখার ইচ্ছে থাকলে শীতের শেষাশেষিই সব থেকে ভাল সময়। এবং হেমিস পর্যটকদের কাছে জাতীয় উদ্যানের বাড়তি আকর্ষণ হল বিখ্যাত হেমিস উৎসব। প্রতি বছর গ্রীষ্মে হেমিস মনেস্টারিতে যা ধুমধাম করে পালিত হয়।

জাতীয় উদ্যান * হেমিস

তবে গাঢ় নীল আকাশের নীচে সিন্ধু নদের হাত ধরে উপত্যকার রুক্ষ প্রান্তর কোথাও বিশাল উঁচু বরফ পাহাড়ে ছড়িয়ে থাকা এই হেমিস জাতীয় উদ্যান কিন্তু একেবারে নিরবিরোধী নয়। মানুষ আছে তো তাই সেখানে দ্বন্দ্বও আছে। এক তো বন্যপ্রাণীদের বাসস্থান একটু একটু করে তারা দখল করছে। তার ওপর তাদের গৃহপালিত প্রাণীদের সংখ্যাও বেড়েই চলেছে, যারা বন্যপ্রাণীদের খাদ্যেও ভাগ বসাচ্ছে। তাই উভয়ের মধ্যে মারপিটও শুরু হয়েছে। চোরা গোপ্তা পরস্পরের লাশ ফেলে দেওয়াও চলেছে। তবে এই সব বন্ধ করতে একদিকে বন্যপ্রাণ ও জীববৈচিত্রের সংরক্ষণ, অপর দিকে স্থানীয় মানুষদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়েছে জম্মু কাশ্মীর সরকার। প্রজেক্ট স্নো লেপার্ড, লাদাখ ইকো ট্যুরিজম প্রজেক্ট, লাদাখ হোমস্টে ইত্যাদি নানা ধরনের প্রকল্প চালু করেছে সরকারের বন দপ্তর। অবশ্য প্রকল্পগুলি সফল হলে তবেই এই অসাধারণ জাতীয় উদ্যানটির গৌরব অটুট থাকবে।

সূত্রঃ স্যাঙচুয়ারি, উইকিপিডিয়া

অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে দিব্বি বাঁচে

শকুনরা যে খাওয়া-দাওয়ার পরও বেঁচে থাকে তা প্রকৃতির এক বিষম বিস্ময়। কারণ তারা যা খায় অন্য কোনও প্রাণী তা খেলে, তারা ভোজনের পরেই নির্ঘাত মারা যেত। শকুনের খাদ্য তালিকায় সুখাদ্য বলতে বাঘ সিংহের উচ্ছিষ্ট যেমন থাকে, তেমনই আবার থাকে পচা-গলা মাংসের মত কুখাদ্যও। আর তা ভোক্ষণ করে তারা বেশ তৃপ্ত হয়ে উড়ে বেড়ায়। প্রকৃতির এই ব্যবস্থাকে অদ্ভুত বললে খুবই কম বলা হয়। কিন্তু পরিবেশকে পরিষ্কার রাখার জন্যই প্রকৃতি শকুনের মত প্রাণী সৃষ্টি করেছে আর সে জন্য তাকে দিয়েছে এমন এক হজম শক্তি যা প্রায় সব প্রাণীকেই হার মানায়। তাদের পাকস্থলিতে গিয়ে ভয়ঙ্কর সব জীবাণুরা মরে যায় আর শকুনরা থাকে খোশমেজাজে।

অ্যাটলান্টিকে বহিরাগতের দাপাদাপি

প্রশান্ত মহামাগরের মাছ অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে এসে হুলুস্থুলুস বাঁধিয়ে দিয়েছে। মাছটির নাম ‘লায়ন ফিশ’, অর্থাৎ সিংহ মাছ। নাম থেকেই অনুমান করা যায় যে তারা বেশ পোক্ত শিকারি। নিজেদের বাসস্থান প্রশান্ত মহাসাগরে তাদের আচরণ কিছুটা সংযত হলেও, অ্যাটলান্টিকে এসে তারা নাকি একেবারে দস্যুবৃত্তি শুরু করে দিয়েছে। বলা হচ্ছে তাদের খাবারের চাহিদা আর বিরামহীন শিকার ওই মহাসাগরের কোনও কোনও এলাকা একেবারে মাছ শূন্য করে তুলছে।

মাছ বিশেষজ্ঞ মাইকেল ওয়েবস্টার বলেছেন যে শিকার করার ব্যাপারে মাছেরা কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলে। শিকারি মাছেরা সেখানেই খাবারের সন্ধানে যায় যেখানে শিকারের ঝাঁক বড়। একটা এলাকায় মাছের সংখ্যা কমে এলে শিকারিরা মাছ ধরতে চলে যায় অন্যত্র। এইভাবে তারা স্থান বদল করতে থাকে, যাতে এক জায়গায় মাছের সংখ্যা কমে গেলে তা কিছুদিন পরে আবার পুরন হয়ে যায়।

লায়ন ফিস

প্রশান্ত মহাসাগরের লায়ন ফিশ কিন্তু অ্যাটলান্টিকে এসে সব নিয়ম কানুন ভেঙ্গে ফেলছে। বিজ্ঞানীরা দেখছেন যে শিকারের সংখ্যা খুব কমে গেলেও লায়ন ফিশ তাদের শিকারের জায়গা পরিবর্তন করছে না। তারা যা পায় তাই খায়, আর তুখোড় শিকারি হওয়ার সুবাদে খাবার জুটিয়েও নিচ্ছে। অথচ লায়ন ফিশকে শিকার করবে, তেমন শিকারিও প্রায় নেই। তাদের পিঠের শক্ত দাঁড়াগুলি খুবই বিষাক্ত। তাই তাদের ধারে কাছে বিশেষ কেউ সাহস করে ঘেঁষে না। আবার, যেহেতু তারা ভিনদেশী মাছ, তাই তারা শত্রু না মিত্র স্থানীয়রা তা ঠাহর করে উঠতে পারে না। ফলে লায়ন ফিশের হাত থেকে বাঁচার উপায়ও স্থানীয় মাছেরা এখনও আয়ত্ত করেত পারে নি। তাই সহজেই লায়ন ফিশের পেটে চলে যাচ্ছে তারা।

বিজ্ঞানীরা বলছেন যে ওই শিকারী মাছ সমুদ্রের খুব গভীরে যেমন থাকতে পারে, তেমনই আবার জলের তলায় বিভিন্ন ধরণের পরিবেশের সঙ্গে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে, আর বংশবৃদ্ধিও করে খুব দ্রুত হারে। তাই অ্যাটলান্টিকে তাদের সর্ব্বগ্রাসী উপস্থিতি ভাবিয়ে তুলছে বিজ্ঞানীদের।

সূত্রঃ সায়েন্স ওয়ার্ল্ড

গাছের জন্য বাঁচা, গাছের জন্য জীবন

গাছ লাগানো যেন হয় আমাদের পন

শঙ্খ চন্দ্র ● অমিত হালদার

RNI Regn No. WBBEN/2000/1531 Date of Publication: January 1, 2015 Postal Regn No.KOL RMS/262/2013-15

অবাক পৃথিবী

● অ্যান্টার্কটিকা হল পৃথিবীর বৃহত্তম হিমবাহ।

● জাপানের ম্যাকাকরা মানুষের মতোই মজা করার জন্য স্নোবল তৈরি করে।

● বছরে ১০ সেন্টিমিটার করে হাওয়াই দ্বীপ জাপানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

● চিনে কেউ পান্ডা মারলে তার শাস্তি মৃত্যু দন্ড।

● আমরা যে কোনও পানীয় বা সবজি, ফল, মাছ, মাংস ইত্যাদি যাই খাই না কেন সবেই আছে প্রচুর জল। যেমন ডিমে আছে ৭৩% জল, মাংসে ৭৫%, আলুতে ৭৫%, শশায় আছে ৯৫% জল।

● কাঠবেড়ালিরা নিজেদের অজান্তেই বছরে অন্তত কয়েক হাজার গাছ লাগিয়ে ফেলে। কারণ তারা গাছের বীজ খাওয়ার জন্য সংগ্রহ করলেও কোথায় যে লুকিয়ে রাখে সেটা ভুলে যায়, আর সেই বীজ থেকেই গাছ অঙ্কুরিত হয়।

আলো ফুটে বেরোয় পোকার শরীর থেকে

এক অদ্ভুত পোকার সন্ধান পাওয়া গেছে পেরুর জঙ্গলে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরু। অনেকটাই জঙ্গলে ঢাকা। প্রাণী বিজ্ঞানীরা সেখানে এমন এক পোকার সন্ধান পেয়েছেন যার শরীর থেকে আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ে **(ছবি)**। তাঁরা বলেছেন যে ওই আলো দেখে অন্য পোকামাকড় আকৃষ্ট হলে তারা তাদের খেয়ে ফেলে।

জেফ ক্রেমার নামের এক আলোকচিত্রি পেরুর জঙ্গলে ছবি তোলার সময় রাত কাটাচ্ছিলেন এক লজে। সেখানে রাতের অন্ধকারে উনি দেখতে পান তাঁর ঘরের দেওয়ালে যেন জ্বলছে খুব ছোট ছোট আলো। ভাল কলে লক্ষ করে দেখেন সেগুলি ছোট ছোট পোকা যাদের শরীর থেকে বেরচ্ছে আলো। ওই বিচিত্র পোকাদের কথা উনি জানান প্রাণী বিজ্ঞানীদের যাঁরা ওই জঙ্গলেই ক্যাম্প করে ছিলেন সে সময়।

অনুসন্ধান করে দেখা যায় সেগুলি প্রাপ্তবয়স্ক পোকা নয়, বরং এক ধরণের বিট্‌ল-এর বাচ্চা। শরীরের ওই আলোর সাহায্যে তারা শিকার ধরে নিজেদের খিদে মেটায়। বড় হয়ে গেলে তারা আর শিকার করে না। তখন তারা ফুল আর মধু খেয়ে থাকে। তবে শৈশবে তাদের শরীরে কী করে আলো তৈরি হয় তা জানা যায় নি।

অবশ্য পেরুর পোকা বিশেষজ্ঞ আরণ পোমেরান্তস বলেছেন যে পৃথিবীতে ওই ধরণের আলো-বিচ্ছুরণকারী ২০০ প্রজাতির বিট্‌ল বা গুবরে জাতীয় পোকা আছে।

ক্যুইজ?!?!

১। হিন্দুকুশ পর্বতমালার উচ্চতম শৃঙ্গ কি?
(ক)কে২ (খ) তিরিচ মির (গ) নন্দাদেবী (ঘ)নাঙ্গা পর্বত

২। নীচের চার পর্যটক/আবিষ্কর্তা ও বন্ধনীতে তাদের দেশের মধ্যে কোনটি ভুল?
(ক) মার্কো পোলো(ইটালি) (খ) ইবন বতুতা (মিশর) (গ)ফার্দিনান্দ মাগেলাম(পর্তুগাল) (ঘ) আমেরিগো ভেসপুচ্চি (ইটালি)

৩। প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে সব থেকে বেশি শিশু কিসে মারা যায়?
(ক) ডায়েরিয়া (খ) ম্যালেরিয়া (গ) এইচ আই ভি এবং এইডস (ঘ) হাম

৪। ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনালে হ্যাটট্রিক করেছিলেন কে?
(ক) ব্রেজিলের পেলে (খ) পর্তুগালের ইউসেবিও (গ) ইংল্যান্ডের জিওফ হার্স্ট(ঘ) জার্মানির গার্ড মুলার

৫। বিরাট কোহলি ছাড়া আর কে ক্যাপ্টেন হিসেবে তার প্রথম টেস্টে দু ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেছিলেন?
(ক) সুনীল গাভাস্কার (খ) ডন ব্র্যাডম্যান (গ) গ্রেগ চ্যাপেল (ঘ) ক্লাইভ লয়েড

৬। এর মধ্যে কোন উৎসবটি একটি আঞ্চলিক প্রাণীর নামে?
(ক) সাঙ্গাই (মনিপুর) (খ) বিহু (অসম) (গ) পোঙ্গল (তামিলনাড়ু) (ঘ) সবরিমালা(কেরল)

৭। সাধারণত পুরুষদের শেষ ডেকাথলন এ শেষ প্রতিযোগিতা কি থাকে?

(ক) হাই জাম্প (খ) ১১০ মিটার হার্ডলস (গ) ডিসকাস থ্রো (ঘ) ১৫০০ মিটার দৌড়

৮। চিতা সম্বন্ধে কোনটি ঠিক নয়?
(ক) গর্জন করতে পারে না (খ) এক এক লাফে ৭ মিটার বা ২০-২৫ ফিট পার হতে পারে (গ) ১০ থেকে ১২ বছর বাঁচে (ঘ) কেবল আফ্রিকাতে দেখা যায়

৯। চেতক সম্বন্ধে কোন তথ্যটি ঠিক নয়?
(ক) রাণা প্রতাপের ঘোড়ার নাম (খ) আমাদের বিমান বাহিনীর এক জাতীয় হেলিকপ্টারের নাম (গ) একটি সুপারফাস্ট ট্রেনের নাম (ঘ) একটি মোটর গাড়ির নাম

১০। গরুর পর কোন প্রাণীর দুধ মানুষ সব থেকে বেশি খায়?
(ক) মোষ (খ) উট (গ) ছাগল (ঘ) ভেড়া।

উত্তর : ১/খ; ২/ খ, হবে মরক্কো; ৩/ক, বস্তুত অন্য তিনটেতে মিলে যত শিশু মারা যায়, কেবল পেটের অসুখে মরে তার থেকে বেশি; ৪/গ; ৫/গ; ৬/ক, সাঙ্গাই এক রকম শিঙ ওয়ালা হরিণ; ৭/ঘ; ৮/ঘ, ইরানেও ১০০ বা তার কাছাকাছি চিতা আছে; ৯/ঘ, মোটর গাড়ি নয়, স্কুটারের নাম; ১০/ক।

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট–হ্যারিসন রোড ক্রসিং)
পৃথিবীর ডায়েরি পাওয়া যায়

স্বত্বাধিকারি মালবী গুপ্তর পক্ষে অনীশ গুপ্ত দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট. ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড. কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com